হাসানআল আব্দুল্লাহ

শব্দগুচ্ছ-র তেরো বছর

"কি নাম দেবে পত্রিকার, *কবিতা?*"

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতির্ময় দত্ত। পাশেই বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মীনাক্ষী দত্ত; আমি ও আমার স্ত্রী, নাজনীন সীমন, পিছনের সিটে। আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম তাঁদের বাসায়, ফেরার পথে সৌজন্যবসত নিজের গাড়িতে করে নামিয়ে দিচ্ছেন।

"না, আমার অতোটা সাহস নেই।"

আমি জানি বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায় গেলে বেশ কয়েক মাস তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা *কবিতা* সম্পাদনার দায়িত্ব পড়েছিলো পরবর্তীতে *কলকাতা* পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমালোচক-প্রাবন্ধিক-কবি-অনুবাদক জ্যোতির্ময় দত্তের উপর।

"তাহলে কি নাম দেবে বলে ঠিক করেছো?"

শুরু থেকে আমার একটি বোধ জেগে উঠেছিলো, তা হলো সাহিত্যাঙ্গনে কোনো পত্রিকা অথবা শব্দ-শব্দবন্ধ একবার খ্যাতি অর্জন করলে বা অবদান রাখলে তরুণ লেখক-কবিদের নতুন পত্রিকা কিম্বা অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ, প্রতিষ্ঠিতকে নতুন করে আঁকড়ে ধরার থেকে, নতুনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই তারুণ্যের ধর্ম। ফলতঃ কবিতা বিষয়ক একটি পত্রিকার নাম *কবিতা* রাখাটা যেমন লোভনীয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এই লোভকে অতিক্রম করার শক্তি। তাছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কিংবদন্তী তুল্য এই পত্রিকাটি যার জন্ম না হলে বাংলা কবিতার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো, তাকে যথাযথ সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখাই পরবর্তী সময়ের কবিদের একান্ত কর্তব্য। তাই আমি পুনরুক্তির পথে পা বাড়াতে চাইনি। আবার *কবিতা*র পরে বাংলা ভাষায় একটি নির্ভরযোগ্য পত্রিকার অভাবও অনুভাব করেছি যেখানে তরুণ কবিরা তাদের লেখা পাঠিয়ে অনায়াসে বুক বেধে বসে থাকতে পারে এই ভেবে যে লেখাটি ভালো হলে নাম-পদবী-পরিচিতি ইত্যাদির বিচার ছাড়াই প্রকাশিত হবে।

"নাম দেবো *শব্দগুচ্ছ*।"

লাল বাতির নির্ধারিত বিরতিতে আমার দিকে তাকালেন জ্যোতির্ময় দত্ত। বললেন, "বাহ্! চমৎকার।"

"আপনার পছন্দ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"খুবই পছন্দ হয়েছে।" তাঁর চিরাচরিত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "এগিয়ে যাও।"

"তাহলে আপনাকে পত্রিকার উপদেষ্টা হিসেবে পাচ্ছি!" আমি তাঁর সাথে আমার প্রকাশিতব্য কবিতা পত্রিকার সম্পর্কটা ঠিক করে নেই।

সেদিন সম্মতি দিয়েছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত। ওদিকে বোস্টন থেকে শহীদ কাদরী। কিছুদিন পরে উপদেষ্টাদের কাতারে যোগ দিলেন মার্কিন কবি ও প্রকাশক স্ট্যানলি এইচ বারকান। এই তিনজন উপদেষ্টা বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে পত্রিকার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি যুগিয়েছেন সত্য, কিন্তু এ কথাও প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে কবিতা নির্ভর একটি সুস্থ পত্রিকা করতে ভালো লেখা যোগাড় করার বিকল্প নেই। তার জন্যে দরকার ছিলো তরুণ প্রতিভাবানদের যুক্ত করা, এবং শক্তিশালী প্রবীণ যারা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের উদ্বুদ্ধ করা। হ্যাঁ, প্রথম সংখ্যাতেই *শব্দগুচ্ছ* সফল হয়েছিলো শহীদ কাদরী ও জ্যোতির্ময় দত্তের নতুন কবিতা পাওয়ার গৌরবে। দীর্ঘ নিরবতার খোলশ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন কাদরী। তাঁর সেই কবিতা ঢাকার একটি দৈনিক কোনো অনুমতি বা সূত্র উল্লেখ ছাড়াই পূনর্মুদ্রণ করে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেছিলো। সেটা অবশ্য *শব্দগুচ্ছ*রই এক ধরনের সফলতা বলে ধরে নেয়া যায়।

২.

লিটল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কিত চিরাচরিত নিয়মটি *শব্দগুচ্ছ*র জন্যে কতোটা প্রযোজ্য তা বিবেচনার বিষয়। কারণ, একদল কবি তাদের নিজস্ব কাব্যভঙ্গি উপস্থাপনের জন্যে এই পত্রিকাটি শুরু করেননি। বরং নতুন কবিতার শুদ্ধরূপ খুঁজে বের করা এবং নতুনত্বের সন্ধান পেলে তাকে আমন্ত্রণ জানানোই এই পত্রিকাটির প্রধান লক্ষ্য ছিলো, যদিও দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় পূর্ব ও পশ্চিমের কবিদের মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা। ফলতঃ অনুবাদ বা দ্বিভাষিক উপস্থাপনার দিকে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা বাড়ে। কবি স্ট্যানলি এইচ বারকানের সাথে যোগাযোগ এই পথটিকে অনেকটা প্রশস্ত করে দেয়। কারণ, দ্বিভাষিক কবিতার বই প্রকাশের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবিদের মিলন ক্ষেত্র তার প্রকাশনা সংস্থা। সেই অর্থে *শব্দগুচ্ছ*ও হয়ে ওঠে নানা ভাষার কবিদের উপস্থাপনের

একটি মিলিত পাটাতন। এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে এই পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তী সংখ্যায় লেখকদের যে তালিকা করা হয় তাতে স্থান পান ২০টির অধিক ভাষার কবি। ফলতঃ ২০০৭-এ পত্রিকার সম্পাদককে সম্মাননা দিতে গিয়ে নিউইয়র্কের কুইন্স বোরোর প্রেসিডেন্ট হেলেন মার্শাল লেখেন, "*শব্দগুচ্ছ* পূর্ব ও পশ্চিমের কবিদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সেতু তৈরী করেছে।"

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালী কোনো কবিই পশ্চিমে স্মীকৃতি পাননি। এর কারণ এ নয় যে বিশ্ব মাপের কবিতা আর কেউ লেখেননি। বরং আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কালে বাংলা কবিতা আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভালো অনুবাদের অভাব পূরণ হয়নি। ছিটে ফোটা যে দু'একটি অনুবাদ আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে পেরেছে তা-ও আবার গ্রহণযোগ্য প্রকাশকের আনুকূল্যের অভাবে বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে *শব্দগুচ্ছ* অনুবাদের মাধ্যমে অসংখ্য বাঙালী কবিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে; বরং বিশ্ব কাব্যমহলে বাঙালী কবিদের পরিচিতির যে বিশাল শূন্যতা তৈরী হয়েছিলো, লিটল ম্যাগ হিসেবে স্বল্প পরিসরের ভেতর দিয়ে হলেও এই পত্রিকাটি সেই জায়গায় কিছু কবিকে স্থাপন করেছে। প্রতিসংখ্যায় অনুবাদ প্রকাশের পাশাপাশি ২০০০ ও ২০০৮ সালে দু'টি সম্পূর্ণ অনুবাদ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমান ইংরেজী ভাষী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছে। অন্যদিকে শুরু থেকেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বৃহত্তর কাব্যামোদিদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অবশ্য দিনে দিনে ওয়েবসাইট সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সফ্টওয়ারের উন্নতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এই মুহূর্তে তাই প্রকাশিত পুরো পত্রিকাটিই শব্দগুচ্ছ ডট কম সাইটে পড়া যায়।

৩.

দুটি ফ্রন্ট থেকেই *শব্দগুচ্ছ* নিয়মিত লেখা সংগ্রহ করেছে এবং কখনো মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্চুত হয়নি। ১৯৯৮ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটির সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্ট করা হয়েছিলো যে "...যেমন কিছু ভারি নামের নিচে কালের চর্বিতচর্বন স্থান পাচ্ছে, তেমনি অনেক আনকোরা নামের নিচেও দেখা যাচ্ছে নাবালক শব্দচয়নে উঠে আসা কাঁচা কবিতার আস্ফালন। কেউ কেউ উঠে আসলেও দখলদারিত্ব স্থাপনে ব্যস্ত রয়েছে অনেকেই। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সম্পাদক কিন্তু গুণ বিচারের মাপকাঠি থাকছে না এবং বুদ্ধদেব বসু বা শিবনারায়ণ রায়ের অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। ক্ষতি হচ্ছে বাংলা কবিতার। পিঠ চাপড়ানো সমালোচনা পঞ্চাশ পরবর্তী কবিতাকে লতার মতো বেড়ে যেতে সাহায্য করেছে ঠিকই, শক্তিশালী মহিরুহের মতো কাউকেই দাঁড় করাতে পারছেনা।...আজকের তরুণতম কবিও যদি একটি ভালো কবিতা রচনা করেন তার স্থান *শব্দগুচ্ছে*র পাতায়...।" বাংলা শিল্পসাহিত্যের অঙ্গনে তের বছরে এই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না, তবে *শব্দগুচ্ছ* তার ঘোষণা থেকে একচুলও সরে আসেনি। একযুগের অধিককাল সময় ধরে ভারি ভারি নামের নিচে ঝুলে থাকা অর্বাচিন শব্দমালাকে উপেক্ষা করে তরুণতম শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ঢাকা কলকাতা ও লন্ডনে প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত লেখা সংগ্রহ ছাড়াও ইমেল ফেসবুকের কল্যাণে যেমন বাঙলী কবিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে তেমনি যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ভারত সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠিত লিটলম্যাগ কর্মীদের সহায়তায় বন্ধত্ব গড়ে উঠছে ভিন্ন ভাষী লেখক কবিদের সাথেও। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষার তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা অব্যহত রয়েছে।

একথাও সত্য যে লিটল ম্যাগাজিন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। শিল্প উপস্থাপনার এটি এমন একটি মাধ্যম যা স্বল্প সংখ্যক পাঠকের হাতেই পৌঁছায়। ফলতঃ এর অর্থনৈতিক উন্নতি কখনো ঘটে না। বলা যায়, এক যুগ আগের যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই নিউইয়র্ক শহরে বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে ফুলে ফেপে উঠেছে। সেই অর্থে *শব্দগুচ্ছ* সম্পাদকের অর্থানুকূল্য এবং হাতেগোনা গ্রাহক পাঠকের চাঁদার কল্যাণে টিকে আছে। তবে, এর বিস্তৃতির দিকটি ভিন্ন রকম, মন-জাগতিক, কাব্যান্দোলনের অগ্রপথিক হিসেবে। সম্পাদকীয় নীতি মালায় যেহেতু লেখকের চেহারার থেকে তার লেখাটিকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাই অনেক বন্ধু অনায়াসে পরিণত হয়েছেন নিন্দুকে আবার অচেনা অজানা সমর্থক হয়ে উঠেছেন পরম বন্ধু।

৪.

পত্রিকা বের করার আগে ব্যক্তিগত প্রস্তুতির পর্বটি একেবারে কম দীর্ঘ ছিলো না। প্রথমে শিখে নেয়ার দরকার ছিলো নিউইয়র্কে বসে এমন একটি কাজ করার জন্যে কারিগরি দিকগুলো। কারণ, এটা বেশ জানা হয়ে গিয়েছিলো যে নিজে ওইসব টেকনিকেল বিষয়াদি আয়ত্বে না এনে পত্রিকা বের করতে যাওয়া প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, যা হয়তো দু'একটি সংখ্যা প্রকাশের জন্যে প্রযোজ্য; কিন্তু দীর্ঘদিন পত্রিকা চালানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে নিজস্ব প্রস্তুতির বিকল্প ছিলো না। অতএব এখান থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক সংবাদ* পত্রিকায় বিনা পারিশ্রমিকে ভিড়ে যাই সাহিত্য সম্পাদক পদে, সাথে সাথে চালাতে থাকি 'খেলাঘর' পাতাও। পত্রিকার অফিস ছিলো আমার তখনকার বাসার কাছেই; দিনের কাজ শেষে হেঁটে

হেঁটে পৌঁছে যেতাম। ইতিপূর্বে পরিচিত এক ভদ্রলোকের থেকে মাত্র দুশো ডলারে কেনা পুরোনো একটি ম্যাকিনটশ কম্পিউটরে হররোজ চলছিলো বাংলা টাইপিংয়ের হাতেখড়ি; যা দিয়ে ১৯৯৩ সালে বেরিয়ে গেলো আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "একবিংশ শতাব্দীর আগে।" অতএব টাইপিংয়ে মনের জোর বাড়ার সাথে সাথে, পত্রিকা অফিসে কাজ করে গেটআপ-মেকআপ, পেস্টিং এবং প্রেসের খবরাখবর ইত্যাদি জানার প্রক্রিয়া পুরোপুরি এগিয়ে যাচ্ছিলো। কোয়ার্ক এক্সপ্রেস নামে একটি প্রোগ্রামের কথাও জানলাম তখন, যা ব্যবহার করে *শব্দগুচ্ছ*-র প্রথম আট বছর অনায়াসে উৎরে যায়। তবে তখনকার দিনে, এবং এখনও, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাগুলো সংবাদ সংগ্রহ, সাহিত্যের পাতা, এমনকি সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্যে পুরোপুরি বাংলাদেশের দৈনিকগুলোর উপর নির্ভরশীল। সামান্য দু'চারটি স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করা ওদের জন্যে তাই তেমন কষ্টের কাজ ছিলো না। কিন্তু *শব্দগুচ্ছ* যেহেতু পুনর্মুদ্রণ বা কাট-এন্ড-পেষ্ট এর পক্ষপাতি নয়, এবং যেহেতু নিয়মিত যাচাই-বাছাই-সম্পাদনায় বিশ্বাসী, সেহেতু লেখা সংগ্রহ এই পত্রিকার জন্যে সর্বদাই একটি কঠিন কাজ হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

যাহোক, পত্রিকার নাম ঠিক করা ও অন্যান্য প্রস্তুতি শেষ হলে প্রয়োজন দেখা দিলো ভালো কম্পিউটার ও তার সাথে লেজার প্রিন্টারের। ভাগ্যক্রমে, ১৯৯৮ এর ফেব্রুয়ারীতে ফুলটাইম চাকরী জুটে যাওয়ায় বছরের মাঝামাঝি দিকে কম্পিউটার ও প্রিন্টার কেনার সুযোগও হয়ে গিয়েছিলো। আজকের দিনে মাত্র পাঁচ শত ডলারেও একটি ভালো কম্পিউটার কেনা যায়, কিন্তু তখন প্রয়োজনীয় প্রিন্টার সহ ম্যাকিনটশ জি-ট্রি কম্পিউটার কিনতে খরচ হয়েছিলো সাড়ে তিন হাজার ডলার। তবে ক্রেডিড কার্ড থেকে ধার নিয়ে আস্তে আস্তে শোধ দেবার সুযোগটিই হয়তো *শব্দগুচ্ছ*র জন্মের দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছিলো। লেখা সংগ্রহ, টাইপ সেটিং, প্রুফ দেখা ও ক্যামেরা রেডি প্রিন্ট তৈরী করার পর সুলভ মূল্যের প্রিন্টিং প্রেস খোঁজার জন্যে ব্রুকলিন কুইন্স-এ বেশ কিছুদিন ছোটাছুটিও হয়েছিলো। অবশেষে ওজনপার্কের মার্কিনী এক প্রেস থেকে পত্রিকা প্রিন্ট করে এনে ব্রায়ারউডের বাসায় আমি নাজনীন সীমন ও রুকসানা রূপা তিন জনে মিলে পৃষ্ঠাগুলো স্টাক থেকে আলাদা করে একটির পর একটি সাজিয়ে বড়ো স্টাপেলার দিয়ে পিন মেরে পাঁচশ' পত্রিকা বানিয়ে ফেললাম যার প্রথম পৃষ্ঠায় শহীদ কাদরী ও শেষ পৃষ্ঠায় ঝলসে উঠলেন জ্যোতির্ময় দত্ত। দোকানে দোকানে বিলি করা, পোষ্ট করে লেখক ও শুভানুধ্যায়িদের কাছে পাঠানো এবং নতুন সন্তানের মতো ক্ষণে ক্ষণে ওর দিকে তাকিয়ে রূপ দর্শন ছিলো পরবর্তী সময়ের ব্যস্ততার অংশ। প্রায় বছর পাঁচেক বাসায় বসে পৃষ্ঠাগুলো আলাদা ও পিন মারার এই কাজ চলেছে। পরে অবশ্য দু'একটা বিজ্ঞাপন পাওয়ার ফলে প্রেসকে কিছু বেশী অর্থ দিয়ে এ কাজগুলো ওখান থেকেই করে আনা হতো। দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিভাষিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া ও বুক সাইজে পৌঁছানোর ফলে বাঙালীদের পাশাপাশি কিছু মার্কিনি এমনকি পোর্টোরিকান গ্রাহকও জুটে গেলো। তবে ১৩ বছরে পদার্পণ করেও নতুন সংখ্যা বেরুনোর পর সদ্যজাত সন্তানের মতো বারবার দেখা, তার সৌন্দর্য উপভোগ করে শিহরিত হওয়ার ব্যাপারটি এখনো কাটেনি। এ হয়তো এক মোহ যা যাবার নয়, কখনো যায় না।

৫.

শব্দগুচ্ছ মনে করে পত্রিকায় যারা লেখেন তাদের সম্মানি দেয়া উচিৎ। কিন্তু লিটল ম্যাগ বা এই ধরনের প্রকাশনার উপার্জন ক্ষমতা সীমিত, বিজ্ঞাপন দাতারাও বুঝে থাকেন যে এদেরকে বিজ্ঞাপন দেয়ার মানে অর্থ দণ্ডি দেয়া। ফলে নিতান্ত বন্ধু মহল বা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ছাড়া বিজ্ঞাপন পাওয়া দুরূহ হয়ে যায়। অন্যদিকে কেউ এই ধরনের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে স্বভাবতই পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চান। ফলে এক সময় দু'চারটি বিজ্ঞান জুটলেও, *শব্দগুচ্ছ* এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায়নি। তাই লেখক সম্মানি দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কবিদের সম্মান দেয়ার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি একটি বিশেষ আয়োজন করেন ২০০১ সালে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকদের ভেতর থেকে প্রতি দু'বছর পরপর একজনকে 'শব্দগুচ্ছ কবিতা পুরস্কার'-এ সম্মানিত করা হবে। প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ রাখার জন্যে পাঠক ও লেখকদের কাছ থেকে প্রতি দুই বছর পরপর মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত মনোনয়ন থেকে পাঁচ জনকে নমিনি ঘোষণা দিয়ে সেখান থেকে পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় একজনকে বাছাই করে এই পুরস্কারটি দেয়া হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ২০০ ডলার, একটি ক্রেস্ট ও লেখকের একটি বই বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তবে বই বের করার ব্যবস্থাটি পরবর্তীতে বাদ দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত যারা পুরস্কার পেয়েছেন তারা হলেন, রহমান হেনরী (২০০৯), নাজনীন সীমন (২০০৭), প্রবীর দাশ (২০০৫), বায়তুল্লাহ কাদেরী (২০০৩) ও রুকসানা রূপা (২০০১)। ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত নিউইয়র্ক, ঢাকা ও শান্তিনিকেতনে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কারগুলো তুলে দেন যথাক্রমে শহীদ কাদরী, শামসুর রাহমান, কালীকৃষ্ণ গুহ, রফিক আজাদ ও সৈয়দ শামসুল হক।

শব্দগুচ্ছ এ পর্যন্ত দু'টি অনুবাদ সংখ্যা সহ মোট ছয়টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে, এর চারটি করা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্ট্যানলি কিউনিটস, হুমায়ুন আজাদ ও শামসুর রাহমানের উপর; এই কবিদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে।

অনুবাদ সংখ্যার দু'টির অতিথি সম্পাদক ছিলেন স্ট্যানলি এইচ বারকান ও নিকোলাস বার্নস। তবে পত্রিকাটি সর্বদাই বিশেষ আয়োজন, যেমন শীত সংখ্যা, বর্ষা সংখ্যা, কোনো দিবস উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র ইত্যাদি থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু ভালো কবিতার প্রতি রেখেছে পুরোপুরি আস্থা। সমালোচনা ও অনুবাদকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়াত মনীষী শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন "শব্দগুচ্ছ সুদৃশ্য সুপাঠ্য সুসম্পাদিত।" তেরো বছরে পা দিয়েও পত্রিকাটি প্রশংসার এই ফুলমালা গলায় জড়িয়ে রাখতে চায়।